মাতৃজ্যোতি-পরাঃ

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

আদ্যাশক্তি মহামায়া লীলাময়ী। তিনিই বন্ধন ও মোক্ষের কর্ত্রী। তাঁর মায়াতে বদ্ধ হইয়াই জীব পারিবারিক সংসার ধর্মে প্রবৃত্ত হয়। আবার তাঁর কৃপাতেই সংসারী জীব মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। তাই তিনি মায়া ও মহামায়া দুই-ই। যিনি বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়াতীত, যিনি ত্রিগুণ হইয়াও ত্রিগুণাতীত, যিনি নির্গুণ পরমব্রহ্মের চিতিশক্তি রূপে অগম্য ও অপারম্পার, সেই আদ্যাশক্তিকে লাভ করিবার সাধনাই মাতৃসাধনা। মহাজ্ঞানীগণ যাঁকে 'পরমাত্মা' বলিয়া থাকেন, মাতৃসাধকগণ তাঁকেই 'মা' বলিয়া থাকেন। 'মা' শব্দটি বা মন্ত্রটি ছোট্ট হইলেও মহাশক্তিময়ী ও মধুর। তাই ভক্তিযোগের প্রাথমিক পর্য্যায়ের সাধনায় বাৎসল্য রসের সাধনার সূচনা হয়। এই বাৎসল্যে প্রেম ও ভক্তি দুইয়েরই সমাহার রহিয়াছে। বাৎসল্যে প্রেম স্নেহ-মমতায় মহাভাবময় বিশুদ্ধ জ্যোতির্ময়। দিব্য-মাতৃসত্তা ও দিব্য শিশুসত্তার এক অপরিচ্ছিন্ন চিরন্তন সম্বন্ধ; যেমন, পার্বতীপুত্র গণেশ, কৌশল্যা পুত্র রাম, দেবকী পুত্র বা যশোদানন্দন কৃষ্ণ, রোহিনী পুত্র বলরাম, শচীপুত্র বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইত্যাদি।

পূর্ণ পরমব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূতা পরাসম্বিৎময়ী প্রথম ঋত স্পন্দিতা স্থির ছন্দিতা শক্তি হইলেন ''কুমারী মা''; এই কুমারী শক্তির হৃদয়-কন্দর হইতে আবির্ভূত হন এক পরম পুরুষোত্তম, যিনি হইলেন আদি পুরুষোত্তম 'কৃষ্ণ' ভগবান আদি ভগবৎসত্তা পূর্ণব্রহ্ম। এই পুরুষোত্তম নিত্যকৃষ্ণের নিজেকে ঈক্ষণ করিবার ইচ্ছায় তাঁর সম্বোধি-কেন্দ্র হৃদয় হইতে স্বভাবরূপী আহ্লাদিনী মহাভাব সম্পন্ন চিতিশক্তি পরমা-প্রকৃতি রূপে ভগবতী 'রাধা' দেবী আবির্ভূত হইলেন। এই কারণেই রাধার অন্য আরেক নাম 'শ্রীমতী'; শ্রীমতী অর্থাৎ 'শ্রী' সম্পন্ন 'মতি' যাঁহার, তিনি প্রকাশ বা ঈক্ষণ শক্তিরূপা বিশুদ্ধ মতিসম্পন্না কৃষ্ণের 'শ্রী' অর্থাৎ মাধুর্য্য রূপিণী। শ্রীকৃষ্ণের সৎ-ইচ্ছারূপী অস্তিত্ববোধক সহজাত ব্রহ্ম-প্রকৃতি হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া ইনি পূর্ণ পরমব্রহ্ম স্বরূপের পূর্ণ পরমা প্রকৃতি সত্তা। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ হইলেন পূর্ণব্রহ্মের সমষ্টিভূত সচ্চিদানন্দ ঘন সগুণ বিগ্রহ। এই পূর্ণ পরমব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ হইতে পরমব্রহ্মময় নির্বাণ রূপময় সর্বপ্রথম যে আদি দেববিগ্রহ আবির্ভূত হন তিনি হইলেন 'পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্' দেবাদিদেব মহাদেব শিবব্রহ্ম। এই শিবব্রহ্মের ওঙ্কাররূপ নাদাত্মক অঙ্গ হইতে তাহার পরমাপ্রকৃতি সত্তার আবির্ভাব হইলে পরে পরমব্রহ্মরূপ শিব হন অর্দ্ধনারীশ্বর ও তাঁহার প্রকৃতি সত্তা হন আনন্দস্বরূপা অর্দ্ধনারীশ্বরী বা নাদাত্মিকা ওঙ্কারেশ্বরী 'উমা'।

এই উমাই হইলেন আদ্যাশক্তিরূপিণী 'আদ্যা মা', আদি অখণ্ড মা। এই উমা দক্ষদুহিতা 'সতী' হইয়া মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হইলে ভগবান শিবও মর্ত্যে অবতরণ করিলেন। তপোবলে সতী দেবাদিদেব শিবশঙ্করকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন। তারপর দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিয়া হিমালয় ও মেনার আলয়ে পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং কঠোর তপস্যা করিয়া পুনঃ শিবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন। পার্বতী দেবী পুত্র কামনায় এক অত্যদ্ভুত মহাপুণ্যক তপোলব্ধ যজ্ঞ ও ব্রত পালন করিয়াছিলেন; সেই ব্রত ও যজ্ঞ পালনের পৌরহিত্য করেন ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমার স্বয়ং। যার ফলে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার পুত্ররূপে ব্রহ্মাণ্ডের সকল গণের অধিপতি হইয়া 'গণেশ' রূপে আবির্ভূত হন। ইহার পর আরো একটি অভিনব নিদর্শন হইল মনু ও শতরূপার তপস্যা, যার ফলস্বরূপ ত্রেতা যুগে দশরথ ও কৌশল্যানন্দন হইয়া ভগবান শ্রীরাম পূর্ণব্রহ্ম সনাতন জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে দ্বাপরে দেখা যায় যে বসুদেব, দেবকী ও রোহিনী পুত্র বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে। তারপর কলিতে পূর্ণব্রহ্ম নিত্যকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন আদ্যাশক্তিরূপিণী শচীমাতার ঘর আলো করিয়া 'নিমাই' (বিশ্বম্ভর) নামে জন্মগ্রহণ করিলেন ভগবান, পরবর্তী কালে যিনি হইলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ইহাভিন্ন চারযুগের মধ্যে আরও বহু হরি-নারায়ণের অবতার মর্ত্যে অবতরণ করিয়াছেন। সর্ব ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে

উহাদের পিতা-মাতারা কঠোর তপস্যা করিয়া ভগবৎস্বরূপ পুত্র বা কন্যা লব্ধ হইয়াছিলেন।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবৎসত্তা যখন দেহধারণ করেন তখন মূল আদ্যা প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়াই দেহধারণ করেন। যেমন — পার্বতীপুত্র গণেশ, দেবহুতি কন্যা অরুন্ধতী, শচী পুত্র শ্রীচৈতন্য, কলাবতী (কৃত্তিকা) কন্যা শ্রীরাধা ইত্যাদি। ভগবৎবেত্তাস্বরূপ পরমব্রহ্মের প্রতিভূ যখন আবির্ভূত হন তখন তাঁহারা মূল আদ্যা প্রকৃতি বা আদ্যাপ্রকৃতির অংশসম্ভূতাকে অবলম্বন করিয়াই আবির্ভূত হন। যেমন — পার্বতীপুত্র কার্তিকেয়, সুজাতা পুত্র পরশুরাম, দেবহুতি পুত্র কপিল, মেরুদেবীর পুত্র ঋষভদেব, মায়াদেবীর পুত্র গৌতম বুদ্ধ, মেরী পুত্র যীশু, বিশিষ্টাদেবীর পুত্র রুদ্রাবতার আদি শংকরাচার্য্য, ফাতেমা পুত্র সূফী আবদুল কাদের জিলানী (ইরাক) ইত্যাদি।

যাঁহারা ভগবৎসত্তা ও ভগবৎবেত্তাগণের জন্মদাতৃ জননী, যাঁহারা মহাত্মাগণের জন্মদাতৃ মাতা তাঁহারা শুধুমাত্র এই জগতে কেন এই ব্রহ্মাণ্ডের পরম প্রণম্যা। সেই মাতৃগণ সকলেই কোন না কোন জন্মে অশেষ সুকৃতি ও পুণ্যতপোবলে ঈশ্বরাত্মাকে গর্ভে ধারণ করিয়া রত্নগর্ভার আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এনারা সকলেই মাতৃজ্যোতিতে পুণ্যা ও ধন্যা। মায়ার গণ্ডীতে থাকিয়া এই সকল মাতাগণের বাৎসল্যের আরাধনা সম্পন্ন হইয়াছে নিশ্চিত। এই কারণে শাস্ত্রে বলা হইয়াছে —''জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'' — জননী পরমা প্রকৃতি মঙ্গলদায়িনী মা।

দিব্যজননী পরাসম্বিৎময়ী 'কুমারী মা' অখণ্ড কালশক্তিরূপা মাতৃসত্তা করালবদনা 'কালী'। এই মাতৃসত্তার এক সাধক জীবনে বাৎসল্যরসের পরম প্রকাশের একটি সত্য ঘটনা এস্থলে ব্যক্ত করা হল।—

''কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ দিনরাত্রি মাতৃধ্যানে বিভোর থাকেন। প্রতি অমাবস্যা নিশীথে জগজ্জননীর আদিষ্ট বিগ্রহ তিনি স্বহস্তে নির্মাণ করেন। মায়ের পূজা সমাপ্ত হইলে গঙ্গাজলে তিনি দেবী বিগ্রহকে আবার দেন বিসর্জন। এই নিভৃত পূজা অনুষ্ঠিত হয় পরমশ্রদ্ধা ও শুদ্ধাচারের সহিত। দেবীর সেবা পূজার উপচার ও উপকরণ সংগ্রহে কৃষ্ণানন্দের উৎসাহের অভাব কোনদিনই দেখা যায় না।

সেদিন অমাবস্যা তিথি ছিল। গভীর রাত্রিতে কৃষ্ণানন্দের শ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হইবে। তাই ভোরবেলা হইতে অন্তর তাহার উৎসাহে উদ্দীপনায় ভরপুর। পূজার উপকরণ সংগ্রহের জন্য গৃহ সংলগ্ন উদ্যানের এদিক-ওদিক তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, অদূরে একটি কদলী বৃক্ষে এক কাঁদি সুপুষ্ট কদলী বেশ পরিপক্ক হইয়া রহিয়াছে। এ সময়ে এরকম উৎকৃষ্ট কদলী সহসা পাওয়া যায় না। কৃষ্ণানন্দের মন খুশীতে ভরিয়া উঠিল। ভাবিলেন, আজ রাতে মায়ের পূজা ও ভোগে এগুলি কাজে লাগাইবেন। বিকালবেলায় অবসর মতো এই কদলীর কাঁদিটি নামাইয়া নিলেই চলিবে।

দিনশেষে ঐ বাগানে প্রবেশ করিয়া কিন্তু তাঁহার খেদের সীমা রহিল না। সুপক্ক কদলীগুলি কে যেন ইতিমধ্যে কাটিয়া নিয়া গিয়াছে। মনে বড় দুঃখ ও অনুতাপ হইল কারণ সঙ্কল্প করা বস্তুটি মায়ের ভোগে আর লাগানো গেল না।

ঘরে গিয়া কৃষ্ণানন্দ শুনিলেন, ভ্রাতা সহস্রাক্ষ এই কদলী তাঁহার ইষ্ট বিগ্রহের পূজায় নিবেদন করিয়াছে, গোপালের ভোগে উহা এই মাত্র লাগানো হইয়াছে। ভ্রাতাকে কোন কিছু না বলিয়া মনের ব্যথা তিনি মনেই চাপিয়া রাখিলেন।

মধ্যরাত্রে শ্যামাপূজার অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেল। কৃষ্ণানন্দ ধ্যানে বসিলেন, কিন্তু আজিকার ধ্যান যেন মোটেই জমিতেছে না। বারংবার তাঁহার মনে পড়িতেছে সেই সুপক্ক কদলীর কথা। মনে মনে অনুশোচনাও কম নাই। নিজেরই গৃহের বস্তু জগন্মাতাকে ভোগ দিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিলেন, কিন্তু তাহা নিবেদন করিতে পারিলেন কই? শুধু তাহাই নহে, মায়ের ভোগে না লাগিয়া ইহা লাগিয়া গেল বালগোপালের ভোগে? ভ্রাতা সহস্রাক্ষের আরাধিত এ বিগ্রহটিকে কৃষ্ণানন্দ বড় একটা আমল দেন না। নিজের ইষ্টদেবী ব্রহ্মময়ী শ্যামামায়ের তুলনায় এ বালগোপালের গুরুত্ব তাঁহার কাছে তেমন কিছু নহে। সত্য কথা বলিতে কি, শক্তি আরাধনার তুলনায় ভক্তিসাধনা তাঁহার নিকট চিরদিনই তুচ্ছ বলিয়া মনে হইয়াছে। আচার্য্যের মনের খেদ এখনও যায় নাই, তাই তাঁহার ধ্যানও তেমন গাঢ় হইতেছে না। অবশেষে পূজাগৃহের কাজকর্ম চুকাইয়া, দুয়ার বন্ধ করিয়া অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু একি অত্যদ্ভুত ব্যাপার! অনতিদূরে ছোটভাই সহস্রাক্ষের স্থাপিত গোপাল বিগ্রহের কুটির, এই গভীর রাতে সেখানে আলো জ্বলিতেছে কেন? সহস্রাক্ষ কি এখনো ধ্যানজপ করিতেছে?

গোপালের পূজাকক্ষে ঢুকিয়া কৃষ্ণানন্দ যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে বিস্ময়ে তাঁহার বাক্‌স্ফূর্তি হইল না। তিনি দেখিলেন

— তাঁহার ইষ্টদেবী শ্যামা মা বালগোপালকে কোলে তুলিয়া নিয়াছেন আর সম্মুখে রক্ষিত নৈবেদ্যের থালা হইতে একটি একটি করিয়া কদলী তুলিয়া খাওয়াইতেছেন। এ দৃশ্য যেমন অলৌকিক, তেমনই প্রাণস্পর্শী।

আগমবাগীশের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে মুহূর্ত মধ্যে একটি আবরণ অপসৃত হইয়া গেল। দেখা দিল নূতন চেতনার এক সত্যের আলোক-উদ্ভাস। তাঁহার হৃদ্‌চেতনায় শ্যামা ও শ্যামের পার্থক্যবোধ সেদিন চিরকালের জন্য বিলীন হইয়া গেল। হৃদয়ে উদ্‌গত হইল শক্তি আরাধনার এক উদার সার্বভৌম অনুভূতি — কালী ও কৃষ্ণ সেখানে একাকার।''

—(সহায়ক গ্রন্থ : ভারতের সাধক)

— হরি ওম্ তৎ সৎ —